প্রভেদ কিছু ছিল না, কিন্তু হিন্দু চিত্রকলার উদ্দেশ্য, অনুভূতি এবং মেজাজ ছিল স্বতন্ত্র। মুঘল চিত্রকলার প্রধান বিষয়বস্তু ছিল কঠোর বাস্তব। রাজনৈতিক ঘটনাবলী, রাজকীয় শিকার ইত্যাদিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল মুঘল চিত্রকর্মে। কিন্তু প্রাচীন হিন্দু চিত্রকলার ধারায় মূল উপাদান ও বিষয়বস্তু ছিল প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বিষয়ভিত্তিক কল্পনা। মন, শরীর ও জীবনের সাথে ছিল তার আত্মিক যোগ। *পার্শী ব্রাউন* লিখেছেন ঃ *"The Mughal painting confined itself to portraying the some what materialistic life of the court, with its state functions, processions, hunting expeditions where as the Hindu school living mentally and bodily in another more abstract enviornment, and pictured senses from the Indian classics, domestic subjects and illustrations of the life and thought of their motherland and its creed."* মুঘল চিত্রকলার আর একটি বৈশিষ্ট্য বা নতুনত্ব হল ছোট পরিসরে চিত্রাঙ্কন কিংবা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের ব্যাখ্যা-চিত্র অঙ্কন। সুলতানি

আমলে বৃহৎ পরিসরে চিত্রাঙ্কন হলেও, ক্ষুদ্র চিত্র অঙ্কন-পদ্ধতি তখন অবহেলিত ছিল। সুলতানি আমলের সংগৃহীত কিছু কিছু গ্রন্থে ইরাকী বা পারসিক ব্যাখ্যা-চিত্র পাওয়া গেলেও, সুলতানি পৃষ্ঠপোষকতায় এদেশে তখন এই কাজ সমাদর পায়নি। মুঘল যুগে ছোট চিত্রাঙ্কন এবং গ্রন্থ-চিত্রের অঙ্কন—দুটি কাজই গুরুত্ব পায়। শিল্পীর কল্পনা এবং বাদশার মর্জি অনুযায়ী মুঘল চিত্রকলায় কখনো আঙ্গিক, কখনো চিত্রের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য, কখনো বা বিষয়বস্তুর প্রকাশকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বিষয়বস্তু হিসেবে কঠোর রাজনৈতিক ঘটনাবলী, যুদ্ধ-অভিযান, দরবারী রাজনীতি যেমন গুরুত্ব পেয়েছে, তেমনি গুরুত্ব পেয়েছে নৈসর্গিক চিত্র, পশু, পাখী কিংবা রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্যের কাহিনী।

পারসিক চিত্রধারা অনুসারে মুঘল-ভারতীয় চিত্রধারার বিকাশে স্মরণীয় দুটি নাম হল *বায়াজিদ* এবং তাঁর শিষ্য *আগামারিক*। পারস্যের সাফাভি-বংশীয় সুলতান শাহ ইসমাইলের পৃষ্ঠপোষকতায় বায়াজিদ মোঙ্গলীয় চিত্রকলাকে পরিবর্তিত করে পারসিক চিত্রধারার সৃষ্টি করেন। 'প্রাচ্যের রাফায়েল' নামে বন্দিত বায়াজিদই প্রথম প্রকৃত অর্থে প্রতিকৃতি অঙ্কনের রীতি-পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। জনৈক প্রখ্যাত চিত্র-সমালোচকের মতে, *"চীন ও জাপানের চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য হল তার রেখাঙ্কন, পারসিক চিত্রের বৈশিষ্ট্য হল তার রেখা ও রঙ এবং ভারতের বৈশিষ্ট্য হল রঙের সুষম প্রয়োগ।"* **এডওয়ার্ডস গ্যারেটের** মতে, মুঘল যুগের চিত্রকলায় এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের অপূর্ব অঙ্গীভূতকরণ এবং সমন্বয়সাধন করা সম্ভব হয়েছে। এই সমন্বয়ের ফলে মুসলিম চিত্রকলার যেমন রূপান্তর ঘটেছে, তেমনি হিন্দু চিত্রশিল্পেও নতুনত্ব এসেছে। *'তারিখ-ই-খান্দান-ই-তৈমুর'* এবং *'বাদশাহ নামা'* গ্রন্থে এই ক্রম-পরিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করা যায়। ***আচার্য যদুনাথ সরকার*** লিখেছেন, *"প্রথম গ্রন্থের ক্ষেত্রে চৈনিক রেখাঙ্কন-পদ্ধতি কিছুটা নমনীয় রূপে গৃহীত হয়েছে এবং দৃশ্যাবলীতে ভারতীয় প্রকৃতির আভাস পাওয়া যায়। এবং দ্বিতীয়টিতে চৈনিক প্রভাব সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত এবং ভারতীয় ধারার প্রাধান্য স্পষ্ট।"*

ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর ছিলেন আন্তরিকভাবে নিসর্গপ্রেমিক। প্রকৃতির ঋতুবৈচিত্র্য, তার রূপ পরিবর্তন প্রভৃতি তিনি অবলোকন করতেন একাত্মমনে। আশ্চর্যজনক বিষয় হল এমন আন্তরিকভাবে প্রকৃতিপ্রেমিক হওয়া সত্ত্বেও বাবর কোন চিত্র অঙ্কন করেননি। কিন্তু *বিনিয়ন* (L. Binyon) মনে করেন, বাবর চিত্রশিল্পকে উন্নত করার জন্য কোন উদ্যোগ না-নিলেও তাঁর দরবারের চিত্র-শিল্পীরা পৃষ্ঠপোষকতা পেতেন। ফার্সী ভাষায় রচিত তাঁর আত্মজীবনীর রূপায়ণ থেকে অনুমান করা যায় যে, চিত্রশিল্প তখন সম্পূর্ণ অবহেলিত ছিল না। তথাপি তাঁর মধ্যে তৈমুরবংশের সহজাত শিল্পবোধ ও শিল্পী-প্রীতির অভাব ছিল না বলে তিনি এদেশে চিত্রকলার ক্ষেত্রে নবজীবনের প্রবর্তক হিসেবে কৃতিত্বের অধিকারী হয়ে আছেন। আগেই বলা হয়েছে যে, মুঘল চিত্রশৈলীর রস সংগৃহীত হয়েছে পারস্য থেকে। হুমায়ুনের ভাগ্যবিপর্যয় এবং পারস্যে রাজনৈতিক আশ্রয়গ্রহণের ঘটনা বস্তুত মুঘল-চিত্রকলার সূচনার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। কাকতালীয় ভাবে ধর্মীয় গোঁড়ামির জন্য পারস্যের শাহ তহমাস্প-এর চিত্রকলার প্রতি অনীহা এবং একই সময়ে রাজনৈতিক প্রয়োজনে হুমায়ুনের পারস্যে অবস্থান, ভারতবর্ষে পারসিক চিত্রশিল্পীদের আগমনের পথ প্রশস্ত করে দেয়। পারস্যের দুই দিকপাল চিত্রশিল্পী *মির সৈয়দ আলি* এবং *আব্দুস সামাদের* সাথে তিনি পরিচিত হন এবং কাবুলে তাঁর

অস্থায়ী রাজধানীতে তাঁদের আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন। সেখান থেকে তাঁরা হুমায়ুনের সঙ্গে দিল্লীতে আসেন এবং চিত্রসৃষ্টির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। হুমায়ুন এবং আকবর এই দুই শিল্পীর কাছে নিয়মিতভাবে চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি অনুশীলন করতেন বলে কথিত আছে। কাবুলে অবস্থানকালে আব্দুস সামাদের অঙ্কিত কিছু চিত্র জাহাঙ্গীর সম্পাদিত *'গুলশান এ্যালবামে'* সংগৃহীত আছে। সামাদকে বলা হত *'শিরীনকলম'* অর্থাৎ তাঁর লেখনী থেকে যেন মধু ঝরত। দিল্লীর সিংহাসন পুনর্দখল করার পর হুমায়ুন পুত্র আকবর চিত্রাঙ্কনশিক্ষা এবং চিত্রকলার চর্চার জন্য এই দুই প্রথিতযশা শিল্পীর নেতৃত্বে একটি স্বতন্ত্র দপ্তর গড়ে দেন। এঁদের অধীনে আরো বহু দেশী-বিদেশী শিল্পীর সমন্বয়ে চিত্রকলাচর্চার কাজ এগোতে থাকে।

মুঘল যুগে চিত্রকলাচর্চার প্রাথমিক পর্বে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কাজ হল *"দস্তান-ই-আমীর-হামজা"* শীর্ষক চিত্রাবলী। এটি সাধারণভাবে *'হামজানামা'* নামে বেশি পরিচিত। প্রায় ১২০০ চিত্রসম্বলিত এই এ্যালবামের অধিকাংশই নষ্ট হয়ে গেছে। হজরত মহম্মদের খুল্লতাত আমীর হামজার জীবনের কৃতিত্বপূর্ণ ঘটনাভিত্তিক আধাপৌরাণিক ও কল্প-কাহিনীমূলক এই চিত্রগুলি আকবরের খুব প্রিয় ছিল। কিন্তু পাণ্ডুলিপির কোথাও চিত্রকরের নাম, পরিচয় বা তারিখ উল্লেখিত না-থাকার ফলে এই চিত্রগুলি পণ্ডিতমহলে কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। *বদাউনি* এবং *শাহনওয়াজ* খান-এর মতে, সম্রাট আকবরের উদ্যোগে বায়াজিদের সমতুল্য প্রায় পঞ্চাশ জন শিল্পীর পনের বছরের ফল, এই অমর চিত্রগুচ্ছ। এই অর্ধশত শিল্পী প্রথমে মীর সৈয়দ আলি এবং পরে আব্দুস সামাদের নেতৃত্বে *'হামজানামা'* অঙ্কনকার্য সম্পন্ন করেন। পক্ষান্তরে, মোল্লা আলাউদ্দিন কাজভিনি নামক লেখক *'নাফাইস-উল্ মাসির'* গ্রন্থে 'হামজানামা' শীর্ষক চিত্রগুচ্ছকে *'হুমায়ুনের মানসপুত্র'* বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, মীর সৈয়দ আলির অধীনেই এর অঙ্কনপর্ব সম্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে, হুমায়ুনের অস্থির রাজনৈতিক জীবন এবং স্বল্পস্থায়ী রাজত্বকালে এই ধরনের বিশাল অঙ্কনপর্ব সমাধা করা সম্ভব ছিল না। সম্ভবত ১৫৭৫-'৭৬ খ্রীষ্টাব্দে এর কাজ সম্পূর্ণ হয়েছিল। উজ্জ্বল এবং একাধিক রঙের প্রয়োগ, পরিকল্পনা জটিলতা এবং ব্যাপকতা, বীরপুরুষ ও বীরাঙ্গনার চিত্রায়ন, রাজপ্রাসাদ, দুর্গ বা সেনাবাহিনীর সাময়িক বাসস্থান সমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ইত্যাদির কাজে শিল্পীরা 'হামজানামা'য় যে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন, তা অভূতপূর্ব।

স্থাপত্যের মতই মমতা ও একাগ্রতা দিয়ে মহান সম্রাট আকবর চিত্রকলাকে লালন-পালন করেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির উদারতা এবং ভারতবোধ ভারতীয় চিত্রকলাকে পারসিক বা চৈনিক প্রভাবের দ্বারা উদ্বুদ্ধ করলেও তাকে বিশিষ্ট ভারতীয় চরিত্র দিতে সক্ষম হয়। *এস.এম. জাফর* লিখেছেন : *"আকবর ভারতীয় চিত্রকলাকে পরানুকরণ-এর কলঙ্ক থেকে মুক্ত করে একে একটি নিরাপদ ও দৃঢ় ভিত্তি দেন (put on a safe and strong footing by removing the stigma of sacrilege attached is it.)।"* বস্তুত আকবরই মুঘল চিত্রকলাকে যে নির্দিষ্ট আবেগ ও প্রেরণা দেন, তাকে ভিত্তি করেই পরবর্তীকালের 'মুঘল চিত্ররীতি'র জন্ম হয়। সমকালীন মুসলিম বিশ্বের দুই দিক্‌পাল চিত্রকর খাজা আব্দুস সামাদ, মীর সৈয়দ আলি-সহ বহু চিত্রশিল্পী তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় অমর শিল্পসৃষ্টি দ্বারা মুঘল চিত্রকলাকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। *বিনয়ন* (L. Binoyn)-এর মতে, প্রকৃতির স্বাভাবিক সৌন্দর্যের প্রতি আকবরের গভীর অনুরাগ ছিল।

প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য এবং সৃষ্টিকর্তার উদ্ভাবনী-শক্তির প্রতি তাঁর সীমাহীন আস্থা। তাই ব্যক্তিগত গৌরববৃদ্ধি বা কৃতিত্বপ্রদর্শন নয়, প্রকৃতির সহজাত সৌন্দর্যের প্রকাশ এবং সৃষ্টিকর্তার গৌরব বৃদ্ধির জন্যই আকবর চিত্রকলার প্রতি অনুরাগ দেখান। ইসলামের নিয়মানুযায়ী মানুষের প্রতিকৃতি আঁকা নিষিদ্ধ বিবেচিত হত। সম্রাট আকবর এই নিষেধাজ্ঞার যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রচারের ওপর জোর দেন। এই প্রসঙ্গে এক সমাবেশে প্রদত্ত সম্রাটের একটি বক্তব্য আবুল ফজলের বিবরণীতে পাওয়া যায়। আকবর যেখানে বলেছেন : *"অনেকে চিত্রকলাকে ঘৃণা করে, আমি তাদের অপছন্দ করি। আমার মতে, চিত্রকরের পক্ষে ঈশ্বরকে জানার একটা স্বকীয় উপায় আছে। কারণ চিত্রকর যখন এমন কিছু আঁকতে চায় যার প্রাণ আছে, যখন সে একের পর এক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অঙ্কন করে, তখন সে উপলব্ধি করে যে তার পক্ষে প্রাণসঞ্চার করা সম্ভব নয়। তখন সে জীবনদাতা ঈশ্বরের মহিমা উপলব্ধি করে, তার জ্ঞান বর্ধিত হয়।"* চিত্রাঙ্কনের সমর্থনে নিজ যুক্তিপ্রদর্শনের পর তিনি সরকারি উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতায় চিত্রকলার চর্চা শুরু করেন। *'আইন-ই-আকবরী'* গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, *"আকবর চিত্রাঙ্কনকে একাধারে শিক্ষা ও মনোরঞ্জনের মাধ্যম বলে বিবেচনা করতেন এবং চিত্রকলার চর্চায় সমস্ত ধরনের সাহায্য ও উৎসাহ সম্প্রসারণ করতে দ্বিধা করতেন না।"* আকবর নিজে ছবির গুণাগুণ বিচার করতেন এবং শ্রেষ্ঠ চিত্রকরদের উৎসাহিত করার জন্য পুরস্কারও প্রদান করতেন।

আকবর চেয়েছেন সর্বধর্মসমন্বয়। বিভিন্ন ধর্মের সারতত্ত্ব জানার জন্য তিনি গড়ে তুলেছিলেন বিভিন্ন ধর্ম-পুস্তকের এক সমৃদ্ধ পাঠাগার। আকবর উপলব্ধি করেন যে রাজপরিবারের সদস্যবৃন্দ এবং কর্মচারীদের বিভিন্ন ধর্মের সারতত্ত্ব বিষয়ে অবহিত করার জন্য অন্যান্য ভাষায় রচিত ধর্মগ্রন্থের ফার্সীতে অনূদিত হওয়া জরুরী। একই সঙ্গে গ্রন্থের বিষয়বস্তুকে সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য তিনি চিত্র-অলংকরণের ওপর জোর দেন। ধর্মপুস্তক ছাড়াও ইতিহাস, জীবনী, দর্শন, কাব্য ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থসমূহের চিত্র-ব্যাখ্যার প্রতিও তিনি জোর দেন। এর ফলে তাঁর আমলে বহু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের চিত্র-অলংকরণ করা হয়। ছোট্ট পরিসরে বিবরণ-মূলক চিত্র-ব্যাখার ইতিহাসে সূচনা হয় এক নব যুগের।

মীর সৈয়দ আলি এবং আব্দুস সামাদের *'হামজানাম'* শীর্ষক এ্যালবামে পারসিক চিত্রকলার প্রভাব ছিল বেশি। *পার্সী ব্রাউন*-এর মতে, 'তানসেনের আগমন' শীর্ষক চিত্রে পারসিক প্রভাবের পরিবর্তে মুঘল ও হিন্দু ধারার অপূর্ব সমন্বয়ের সূচনা ঘটে। ১৫৭০-'৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কালে ফতেপুর সিক্রির দেওয়াল-চিত্র অঙ্কনে ইন্দো-পারসিক চিত্রকলার সমন্বয় আরো স্পষ্ট রূপ পায়। আকবরের আমলের চিত্রকরদের মধ্যে হিন্দু চিত্রকরের প্রাধান্য ছিল লক্ষণীয়। সামাদ ও মীর আলি ছাড়া বহিরাগত খ্যাতিমান চিত্রকর হিসেবে *ফারুক বেগ, খসরু কুলি* প্রমুখের নাম স্মরণীয়। হিন্দু চিত্র-শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন *দশবন্ত, বসাওন, কেশব, মুকুন্দ, মিস্কিন, ফারুক কালমাক, মধু, জগন, মহেশ, খেমকরণ, তারা, হবিবনর্স, লাল, সনওয়ালা* প্রমুখ। আবুল ফজল তৎকালীন যে সতের জন অগ্রণী চিত্রকরের নামোল্লেখ করেছেন, তাদের মধ্যে অন্তত তের জন ছিলেন হিন্দু। মুঘল চিত্রকলার বিকাশে এঁদের অবদান ছিল বিশাল। *আবুল ফজল* এঁদের প্রশংসা করে লিখেছেন : *"their pictures surpass our conception of things. Few, indeed, in the whole world are found equal to them."* দশবন্ত ছিলেন জাতিতে

Miskin the Mughal Painters was a caricaturist. (ব্যঙ্গাত্মক বর্ণনাকারী।)

কাহার (পালকিবাহক)। কিন্তু তাঁর অঙ্কন-প্রতিভা আকবরকে দারুণ মুগ্ধ করেছিল বলে আবুল ফজল উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, দশবন্তের প্রতিভা বায়াজিদ কিংবা চৈনিক চিত্রকরদের তুলনায় কিছু কম ছিল না। 'রজম্‌নামা' গ্রন্থের অলংকরণে দশবন্তের প্রতিভার স্বাক্ষর পাওয়া যায়। অবশ্য এই অলংকরণের মাঝপথে দশবন্তের মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে এবং তিনি আত্মহত্যা করেন। (১৫৪৮ খ্রীঃ)। প্রায় ২৯টি ছবির বহিরঙ্গ তিনি সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলেন। তাঁর কাজ সম্পূর্ণ করেন মহম্মদ শরিফ। এছাড়া, লাল, বসাওন, তুলসী প্রমুখ বহু শিল্পী এই অলংকরণের কাজে হাত লাগান। চিত্রাঙ্কনের বিভিন্ন দিকে বসওয়ানের দক্ষতা ছিল। কলকাতা জাদুঘরে রক্ষিত 'মজনু' চিত্রে তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। অধ্যাপক *অশোক কুমার দাসের* ভাষায় ঃ *"Basawan was the most outstanding painter amongst them who excelled in all the branches of painting—drawing of outline, application of colour, portrait and landscape painting."* ("রজম্‌নামা" ছাড়া আকবরের আমলের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য চিত্রালংকৃত পুস্তক হল *রামায়ণ* (১৫৮৮ খ্রীঃ), *দিওয়ান* (১৫৮৮ খ্রীঃ), *তারিখ-ই-কান্দাহারি, আকবরনামা, বাহারিস্তান* (১৫৯৪-৯৫ খ্রীঃ), *বাবরনামা* (১৫৯৫-'৯৬ খ্রীঃ), *জামিউৎ-তারিখ* (১৫৯৬ খ্রীঃ), আমীর খসরুর *'খামসা'*, হাফিজের *'দিওয়ান'*, *তারিখ-ই-আলফি'* (১৫৯৭ খ্রীঃ) ইত্যাদি। এই সকল গ্রন্থের চিত্র অলংকরণ, গঠনগত ঐক্য এবং স্থান ও রঙ-এর আনুপাতিক প্রয়োগ-এর বিচারে শিল্পীদের চূড়ান্ত দক্ষতার প্রমাণ তুলে ধরে। এই সকল ছোট ছোট চিত্রকল্পে পারসিক, তুর্কী, ভারতীয় এবং ইউরোপীয় শিল্পাদর্শের অপূর্ব সমন্বয়ের ছবি পাওয়া যায়।

ষোড়শ শতকের শেষপর্বে কৃত সুন্দরতম চিত্রের কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় 'আকবরনামা' গ্রন্থের অলংকরণে। সমসাময়িক অন্যান্য গ্রন্থের চিত্রায়নের সাথে আপাতসাদৃশ্য থাকলেও এর অন্যতম বিশেষত্ব হল এখানে চিত্রকর যে বাস্তবতাবোধ এবং বিশ্বাসযোগ্যতা দেখাতে পেরেছেন, অন্যান্য চিত্রে তা নেই। মহান আকবরের জন্মসংক্রান্ত চিত্রটিতে নম্রমাধুর্য আর সজীবতার যে স্পর্শ পাওয়া যায়, তা ইতিপূর্বে অঙ্কিত চিত্রগুলিতে লক্ষ্য করা যায় না। ষোড়শ শতকের শেষপর্বে আকবরের ব্যক্তিজীবনের কিছু দুঃখজনক ঘটনা অন্যান্য অ-রাজনৈতিক বিষয়ের মত চিত্রকলার স্বাভাবিক বিকাশেও কিছুটা মন্থরতা নিয়ে আসে। প্রিয়পুত্র সেলিমের বিদ্রোহ এবং অপর দুই পুত্র মুরাদ ও দানিয়েলের মৃত্যু সম্রাটের মানসিক প্রশান্তিকে যেভাবে আহত করে, তাতে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর সৃষ্টিধর্মী কর্মসূচী কিছুটা ব্যাহত হয়। তাঁর রাজত্বের শেষপর্বের কিছু চিত্র-নির্দশন পাওয়া যায় *'যোগবশিষ্ট'* (১৬২০ খ্রীঃ), *'নাফাহাৎ-উল্-উন্স'* (১৬০৩ খ্রীঃ) এবং *'ইয়ার-ই-দানিশ'* (১৬০৫ খ্রীঃ) গ্রন্থের চিত্রবিবরণীর মধ্যে।

(5) আকবরের মত বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী না-হলেও, চিত্রকলাচর্চার ক্ষেত্রে আকবর যে ধারার সূচনা করেছিলেন, জাহাঙ্গীর তাকে রঙে-রূপে সুসজ্জিত ও সমৃদ্ধ করার কাজে যথেষ্ট আন্তরিকতা দেখান। প্রকৃত অর্থেই তিনি ছিলেন চিত্রকলার সমঝদার অনুরাগী। নিজ আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন ঃ *"একাধিক চিত্রকরের আঁকা একই ধরনের বহু ছবি সামনে রাখলে আমি নিমেষে বলতে পারি কোনটির চিত্রকর কে। এমনকি একাধিক শিল্পী দ্বারা একটিমাত্র ছবি অঙ্কন করলে আমি বলতে পারি, ছবির কোন্ অংশটি কোন চিত্রকর এঁকেছেন।"* এই বক্তব্যে হয়তো অতিরঞ্জন আছে, কিন্তু চিত্রকলার প্রতি যে তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল, তা

'Muraqqas' → were albums of the miniature Paintings.

'Akbar Namah' – manuscripts, containing miniature Paintings, reveals a sense of realism & authenticity, witnessed or experienced by the painters themselves.

প্রমাণ করার পক্ষে এই স্বীকারোক্তি যথেষ্ট। ইংরেজ পর্যটক *স্যার টমাস রো* লিখেছেন যে, *"জাহাঙ্গীর ছিলেন উন্নতমনা চিত্র-সংগ্রাহক। বহু বিদেশী চিত্র তাঁর সংগ্রহশালায় স্থান পেয়েছিল। তিনি বহু প্রখ্যাত চিত্রকে অবিকল নকল করিয়েও নিজ সংগ্রহে রেখেছিলেন।"* পার্সী ব্রাউন-এর ভাষায় তিনি ছিলেন *"the type of rich collector perennial through the ages."* চিত্রকলার প্রতি জাহাঙ্গীরের অনুরাগ ছিল সহজাত ও অকৃত্রিম। আকবরের রাজত্বের শেষপর্বে সম্রাটের উদ্যোগের বাইরে শাহজাদা সেলিমও (জাহাঙ্গীরের পূর্বনাম) চিত্রচর্চার ক্ষেত্রে কিছু সফল উদ্যোগ নেন। হিরাটী চিত্রকর আকারিজার তত্ত্বাবধানে সেলিম একটি চিত্রশালা গঠন করেন এবং অনন্ত, আবুল হাসান, বিষণ দাস প্রমুখ সহ-চিত্রকরের সহযোগিতায় বেশ কয়েকটি গ্রন্থ-অলংকরণের কাজ সম্পন্ন করেন। এগুলির মধ্যে *'রাজকুমার'* এবং *নিজামউদ্দিন দলভি'র 'গজল ও রুবাইৎ'* সংকলনগ্রন্থ (১৬০২ খ্রীঃ) দুটির চিত্র-অলংকরণ বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। *'দিওয়ান'* (হাফিজকৃত) *'আনোয়ার-ই-সুহেলি'* গ্রন্থের অলংকরণের কাজও এইসব শিল্পী সম্পন্ন করেন। এই পর্বে সেলিম ও তাঁর চিত্রকরদের অঙ্কিত চিত্রাবলীর সাথে আকবরের চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগত একটি প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। আকবরের ছবিগুলি ছিল পরিশুদ্ধ ও আভিজাত্যে পূর্ণ ; কিন্তু সেলিমের ছবিগুলির মধ্যে ছিল সারল্য ও গ্রামীণ সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ।

জাহাঙ্গীরের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন একঝাঁক তারকা-চিত্রকর। এঁদের মধ্যে কয়েকটি অতি বিশিষ্ট নাম হল *ফারুক বেগ, দৌলত, ওস্তাদ মনসুর, বিষণদাস, মনোহর, আবুল হাসান, বিচিত্র, গোবর্ধন, মহম্মদ নাদির, মহম্মদ মুরাদ* প্রমুখ। আকারিজার নাম আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবত নাদির ও মুরাদ ছিলেন মুঘল দরবারে শেষ দুই বিদেশী চিত্রকর। এঁদের মধ্যে সর্বাধিক অগ্রণী দুই শিল্পী ছিলেন ওস্তাদ মনসুর ও আবুল সাহান—যাঁদের কৃতিত্বের পুরস্কারস্বরূপ জাহাঙ্গীর যথাক্রমে *'নাদির-অল্-আসর'* এবং *নাদির-উজ্-জামান'* অভিধায় ভূষিত করেছিলেন। বিরল প্রজাতির পশু, অসাধারণ পাখী কিংবা সচরাচর দেখা যায় না এমন ফুলের চিত্র অঙ্কনে মনসুর ছিলেন সিদ্ধহস্ত। এগুলির জীবন্ত রূপাঙ্কন দেখে পশুবিশারদ্ ব্যক্তিগণও আশ্চর্যান্বিত হন। কলকাতা জাদুঘরে সংরক্ষিত সাইবেরীয় সারস এবং বাংলায় ফ্লোরিকানের ছবি দুটি তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ও অঙ্কনপ্রতিভার অনন্য নিদর্শন। তুলনামূলক ভাবে আবুল হাসান ছিলেন অনেক বেশি অভিজাত শিল্পী। রূপকধর্মী চিত্রকলার বিকাশে তাঁর অবদান ছিল সর্বাধিক। রঙের সুষম ব্যবহার যে সামান্য চিত্রকে অসামান্য করে তুলতে পারে, তা প্রমাণ করেছেন আকারিজার এই স্বনামধন্য পুত্র।

জাহাঙ্গীরের আমলে চিত্রকলায় পাণ্ডুলিপির প্রসঙ্গচিত্রের পাশাপাশি বিশিষ্ট ব্যক্তি, সন্ত, গায়ক ও সাধারণ মানুষের প্রতিকৃতি অঙ্কন চিত্রকরদের বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্রে পরিণত হয়। প্রকাশ বর্মা তাঁর *'ইন্ট্রোডাকশন অফ সেফ পোর্ট্রেট পেইন্ট্রি ইন ইণ্ডিয়া'* গ্রন্থে লিখেছেন, মুঘল আমলের প্রতিকৃতি অঙ্কন পারসিক ও প্রাক্-মুঘল ভারতীয় কলা দ্বারা প্রভাবিত। প্রাথমিক মুঘল-রীতির তিন-চতুর্থাংশ মুখচিত্রণ জাহাঙ্গীরের আমলে প্রায় লোপ পেয়ে যায় এবং তার স্থান দখল করে অর্ধ-মুখচিত্রণ। একে তিনি 'মুঘল চিত্রকলার ভারতীয়করণ' বলে অভিহিত করেছেন। জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মজীবনীতে দক্ষ প্রতিকৃতি-চিত্রবিদ হিসেবে *বিষণদাস* ও *আবুল হাসানের* নাম উল্লেখ করেছেন। *সোমপ্রকাশ বর্মার* মতে, 'বিচিত্র' প্রায় সমদক্ষতাসম্পন্ন চিত্রকর

ছিলেন। প্রতিকৃতি-অঙ্কনে মনের ভাব ফুটিয়ে তোলার দিকে বিচিত্র'র প্রয়াস ছিল প্রশংসনীয়। মুখাবয়বের সজীবতা ও লক্ষণগত প্রবৃত্তির অভিব্যক্তিকে তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দেন। তাঁর 'গায়ক, বাদক ও অন্য' চিত্রটিতে এই সজীবতা লক্ষ্য করা যায় স্পষ্টভাবে। *বেসিল গ্রে* এবং *ডগলাস ব্যারট* মুঘল যুগের প্রতিকৃতি-অঙ্কনে আদর্শীকরণ-এর প্রাধান্যের কথা উল্লেখ করেছেন। সমসাময়িক উৎসব বা ঘটনাবলীর সাথে প্রতিকৃতি অঙ্কনের বহু নিদর্শন জাহাঙ্গীরের আমলে পাওয়া যায়। জাহাঙ্গীরের অভিষেক, হোলি, দেওয়ালি, তুলাদান প্রভৃতি উৎসবে জনসমাবেশ ও শিকারের দৃশ্য প্রভৃতি বহু সমধর্মীয় চিত্র নানা সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে। *শ্রীবর্মা* মুঘল যুগে সাধারণ মানুষের চিত্রাঙ্কন ব্যবস্থার নৈতিক ও কলাবিষয়ক গুরুত্বের উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ *"সাধারণ মানুষের যথাযথ চিত্রণ ভারতীয় কলায় মুঘল চিত্রকরদের বিশেষ অবদান।"* বিচিত্র-র উপরিলিখিত চিত্রটি 'সাধারণ মানুষের কাজকর্মের সজীব চিত্রণের' একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সাধারণ মানুষের এত বিশদ চিত্রণ মুঘলপূর্ব কিংবা মুঘল আমলের ভারতীয় কলায় আর দেখা যায়নি।

জাহাঙ্গীরের আমলে মুঘল চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতির আর একটি অভিনবত্ব হল পাড়-চিত্রণ। মূল ছবির সঙ্গে মিল রেখে পাড়-চিত্রণের রেওয়াজ আকবরের আমলেও ছিল। *শ্রীবর্মার* মতে, *'দেওয়ান-ই-হাফিজ'* (১৫৮৫ খ্রীঃ) পাণ্ডুলিপির অলংকৃত পাড়টি পাড়-চিত্রণের প্রথম দৃষ্টান্ত। পরবর্তীকালে *'বাবরনামা', 'খামসা'* ইত্যাদি পাণ্ডুলিপিতে পাড়-চিত্রণের ক্রমবিকাশ ঘটে। জাহাঙ্গীরের আমলে চিত্রকলার এক স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে পাড়-চিত্রণ বিকাশলাভ করে এই পদ্ধতিকে অভিনবত্ব দেয়। শাহজাহানের আমলে এটি প্রভূত বিকাশলাভ করে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, ছবির মূল রূপকার এবং পাড়-চিত্রণের শিল্পী ছিলেন পৃথক ব্যক্তি।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষদিকে রাজনৈতিক ক্ষমতা ক্রমশ সম্রাটের হাত থেকে সরে গিয়ে নূরজাহান বেগমের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। এই পর্বে জাহাঙ্গীরের চিত্রকররা সম্রাটের গুরুত্ব ও কর্তৃত্বব্যঞ্জক এমন কিছু চিত্র অঙ্কন করেন, যার সাথে বাস্তব ইতিহাসের মিল পাওয়া যায় না। যেমন ওয়াশিংটনের আর্ট গ্যালারী, ডাবলিনের চেস্টার বেটি লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত কিছু চিত্রে দেখা যায়, (১) জাহাঙ্গীর ইরানের শাহ আব্বাসকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন কিংবা (২) তাঁর চিরশত্রু মালিক অম্বরের ছিন্নমস্তকে আঘাত করছেন। অথচ প্রকৃত ঘটনা হল পারস্যের শাহ'র সাথে তাঁর কখনোই সাক্ষাৎ হয়নি, কিংবা মালিক অম্বর কখনোই জাহাঙ্গীরের পদানত হননি। সম্ভবত এই সকল কর্তৃত্বব্যঞ্জক চিত্রায়ন দ্বারা সম্রাটের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতার দৈন্যকে চাপা দেবার প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল। চিত্রায়নের এই ধারাটিও অভিনবত্বের দাবি রাখে। *অধ্যাপক এ. কে. দাসের* ভাষায় ঃ *"This feature of presenting the patron-emperor as an all powerful entity pampered by the gods, respected by the kings and loved and feared by the subjects, was a new feature in the development of Mughal painting."*

প্রাক্-মুঘল ভারতীয় চিত্রকলায় ছবির সঙ্গে চিত্রকরের নামাঙ্কন বা স্বাক্ষরদানের রীতি ছিল না। এমনকি মুঘল যুগের প্রাথমিক পর্বের চিত্রগুলিতে যেমন *'হামজানামা', আনোয়ার-ই সুহেলী'* প্রভৃতিতে, এই রীতির অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তবে আকবরের আমলে চিত্রের সাথে তার রূপকারের নাম-অঙ্কনের রীতি চালু হয় এবং জাহাঙ্গীরের আমলে এই রীতি বিশেষ গুরুত্ব পায়।

সম্ভবত আকবর এবং জাহাঙ্গীর চিত্রকলার উন্নয়নের জন্য শ্রেষ্ঠ চিত্রকরদের সম্মানপ্রদান, পদোন্নতিবিধান বা আর্থিক পুরস্কার প্রদান দ্বারা উৎসাহিত করার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন, তাতে ছবির গুণাগুণ বিচারের প্রয়োজনে চিত্রকরের নামাঙ্কন জরুরী হয়ে পড়েছিল এবং তা অনুসৃত হয়েছিল। অবশ্য চিত্রকর নিজে নয়, তার নাম লিখতেন দরবারী লিপিকাররা।

মুঘল স্থাপত্যের চরম উন্নতির কাল যেমন ছিল শাহজাহানের আমল, তেমনি মুঘল-চিত্রকলার চরম উৎকর্ষের কাল হিসেবে জাহাঙ্গীরের আমলকে স্মরণ করা যেতে পারে। চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি, চিত্ররূপ ও রঙের বৈচিত্র্যসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মুঘলচিত্র-রীতিকে পারসিক প্রভাবমুক্ত করে ভারতীয়করণের কাজেও তিনি ছিলেন সফল। *এডওয়ার্ডস* ও *গ্যারেট*-এর ভাষায় ঃ *"Persian artists still lingered at Jahangir's court–but the Persian style grew fainter and fainter and yieldied place during Jahangir's reign to a type which was essential Indian."* *পার্সী ব্রাউন* চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে জাহাঙ্গীরের আন্তরিকতা ও অবদানের প্রশংসা করে লিখেছেন ঃ *"জাহাঙ্গীরের অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল, কিন্তু তার ছিল শিল্পীর দৃষ্টি, যতদিন জীবিত ছিলেন, তিনিই ছিলেন মুঘল চিত্রকলার প্রাণস্বরূপ।"*

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মুঘলচিত্রকলার গৌরব-রশ্মিও অস্তমিত হয়। *পার্সী ব্রাউন*-এর ভাষায় ঃ *"the real spirit of Mughal painting departed with the death of Jahangir,"* শাহজাহান চিত্রকলার তুলনায় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের প্রতি ছিলেন বেশি আগ্রহী। শাসনকালের সূচনাপর্বেও চিত্রকলার প্রতি তাঁর যেটুকু অনুরাগ ছিল, পরবর্তীকালে তাও ফিকে হয়ে যায়। দরবারী চিত্রশিল্পীর সংখ্যা তিনি ভীষণভাবে কমিয়ে দেন। ফলে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভের জন্য শিল্পীদের মধ্যে অশুভ প্রতিযোগিতা শুরু হয়। অন্যদিকে বহু শিল্পী ধনী ও অভিজাত ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায় চিত্রাঙ্কনের কাজ শুরু করেন। ফলে চিত্রাঙ্কনের রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় একচেটিয়া কৃতিত্ব লোপ পায়। কিন্তু জাহাঙ্গীর পর্যন্ত সময়কালে বাদশাহী আনুকূল্যে চিত্রকলার যে স্বাভাবিক ও বর্ণময় বিকাশ ঘটেছিল, আলোচ্যপর্বে তা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে বহু চিত্রকর ব্যক্তিগত উদ্যোগে চিত্রশালা স্থাপন করে নিছক জীবিকা অর্জনের জন্য চিত্রাঙ্কন-কর্ম চালিয়ে যান। পর্যটক বার্নিয়ে এদেশে এসে এই ধরনের বহু চিত্রকরের সন্ধান পেয়েছিলেন যাঁরা বাণিজ্যিক চিত্রাঙ্কনে আত্মনিয়োগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

নিজের বীরত্বব্যঞ্জক চিত্রাঙ্কনের প্রতি শাহজাহানের বিশেষ দুর্বলতা ছিল। এই সকল চিত্রে বর্ণাঢ্যতার প্রাবল্য ছিল, কিন্তু অন্তর্নিহিত প্রাণস্পন্দন ও সৌন্দর্য ছিল না। শাহজাহানের আমলে কৃত চিত্রায়ণের একটি উল্লেখযোগ্য নাম হল *'শাহজাহাননামা'*-র পাণ্ডুলিপি-চিত্রায়ণ (১৬৫৭ খ্রীঃ)। এই ছবিগুলিতে মুঘলচিত্রধারার শেষ আভাস পাওয়া যায়। ভারতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত *'শাহজাহানের সুফী নৃত্যদর্শন'* চিত্রটিও বিশেষত্বের দাবি রাখে। এতদ্‌সত্ত্বেও শাহজাহানের রাজত্বকালকে মুঘল-চিত্রকলার *'শেষদিনের শুরু'* (*Beginning of the end*) বলে অভিহিত করা যায়। *পার্সী ব্রাউন*-এর ভাষায় ঃ *"One defects behind all the lavish display which is the main characteristics of the painting under Shah Jahan, that sense of over-ripeness which is the sure sign of decline."* শাহজাহানের আমলে মুঘল-চিত্রকলার অবক্ষয়ের সূচনা ঘটে এবং ঔরঙ্গজেবের আমলে তা পূর্ণতা পায়। প্রখর বাস্তববাদী

দৃষ্টান্ত আরও আছে। এতদ্‌সত্ত্বেও ঔরঙ্গজেবের আমলে চিত্রচর্চা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি। প্রতিকৃতি অঙ্কনের দিকপাল শিল্পীরা আগের মতই তাঁদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। শিকাররত সম্রাট, পাঠক সম্রাট, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য-পরিচালনারত সম্রাট, এমনি বহু চিত্র তখন অঙ্কিত হয়েছে। ধরে নেওয়া যেতে পারে, সম্রাটের প্রচ্ছন্ন অনুমোদন না থাকলে একাজ করা সম্ভব হত না। *স্যার যদুনাথ সরকার* লিখেছেন যে, গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী পুত্র মহম্মদ সুলতানের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হবার জন্য ঔরঙ্গজেবের নির্দেশমত প্রতিদিন বন্দী শাহজাদার প্রতিকৃতি এঁকে বাদশাকে দেখানো হত। অবশ্য এসবই ছিল আপাত পরিণতি। চিত্রকলার মর্মে প্রবেশ করে তাকে সঞ্জীবিত করার কণামাত্র ইচ্ছা ঔরঙ্গজেবের ছিল না। তাই *এডওয়ার্ডস* ও *গ্যারেটের* ভাষায় বলা যায় ঃ *"It (art of painting) had reached its zenith under Jahangir and has commenced to lose its vitality under Shahjahan, its decline was hastened by the attitude of Aurangzeb."* ঔরঙ্গজেবের অনিচ্ছা ও উদাসীনতা মুঘল দরবারের ঐতিহ্যশালী চিত্রশালার প্রাণবায়ু হরণ করে নেয়। বহু শিল্পী স্থানান্তরে গিয়ে (অযোধ্যা, হায়দ্রাবাদ, পাটনা, মহীশূর প্রভৃতি) আঞ্চলিক শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায়, মুঘল চিত্রকলার ঐতিহ্যকে চলমান রাখার উদ্যোগ নেন। তাঁরা সম্পূর্ণ বিফল হয়তো হননি, কিন্তু দিল্লীর পৃষ্ঠপোষকতায় চিত্রকলার যে উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত বিকাশ ঘটেছিল তা ধরে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

প্রসঙ্গত আলোচ্য পর্বে আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিকশিত চিত্রকর্মের ধারা সম্পর্কে উল্লেখ করা যায়। মুঘলধারা থেকে স্বতন্ত্র হলেও এই পর্বে রাজস্থান ও মধ্য-ভারতের নানা অংশে, যেমন— মেবার, অম্বর, বিকানীর, বুন্দি, মালব ইত্যাদি এবং দক্ষিণ-ভারতের বিজাপুর ও গোলকুণ্ডায় ভারতীয় চিত্রচর্চার কাজ যথেষ্ট গুরুত্বের সাথেই পালন করা হচ্ছিল। রাজস্থানের চিত্রকর্মে মুঘল-চিত্রধারার প্রভাব অবশ্যই ছিল। পোশাক-পরিচ্ছদ, রূপবিন্যাস, পশ্চাদ্‌পট, অলংকরণ, রঙের ব্যবহার ইত্যাদি ক্ষেত্রে মুঘলধারা লক্ষ্য করা অসম্ভব নয়, তথাপি রাজস্থানী চিত্রকলা সামগ্রিক বিচারে তার মৌলিক বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। কর্মসূত্রে বহু রাজপুত শাসক মুঘল দরবারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। স্বভাবতই দেশের বহমান ঘটনাবলীর সাথে তাঁদের প্রত্যক্ষ যোগ থাকত। রাজস্থানী চিত্রকলায় স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সেই সকল ঘটনাবলীর প্রতিফলন দেখা যায়। ধর্মেরও এখানে একটা জোরালো প্রভাব ছিল। ধর্মবিশ্বাস এবং আবেগপ্রবণতার সমন্বয়ে রাজস্থানী-চিত্রকলা অনেক ক্ষেত্রেই মুঘল-ধারাকে অতিক্রম করে গেছে। *ঈশ্বরীপ্রসাদ* লিখেছেন ঃ *"With its spiritual and emotional inspirations it supersedes the secular and matter-of-fact Mughal style."*

সংখ্যায় সীমিত হলেও দেশের দক্ষিণ-প্রান্তের দুটি মুসলিম রাজ্য বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা

চিত্রচর্চার ক্ষেত্রে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছিল। বিজাপুরের দুই বুদ্ধিদীপ্ত শাসক আলি আদিল শাহ (প্রথম) এবং ইব্রাহিম আদিল শাহ (দ্বিতীয়) শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশে ছিলেন যথেষ্ট আন্তরিক। দক্ষিণী চিত্রকলা ছিল খুবই পরিশীলিত, আভিজাত্যপূর্ণ এবং অলংকৃত। এদের মধ্যে ছিল এক শান্ত সমাহিত কাব্যিক ভাব। অবশ্য পাশাপাশি অবস্থান এবং জটিল রাজনৈতিক সম্পর্কের কারণে বিজাপুর, গোলকুণ্ডা এবং আহম্মদনগরের চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতির মাঝে কোন বিভেদরেখা টানা সম্ভব নয়। পুনার ইতিহাস-সংশোধন মণ্ডলে রক্ষিত 'রাগ-রাগিণী' ভিত্তিক কিছু চিত্র বিজাপুরের চিত্রকর্মের অনবদ্য নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ্য। চেস্টার বেটি লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত *'নামজ্-অল্-আলম'* চিত্রকর্মগুলিও বিজাপুরের সৃষ্টি বলে অনুমিত হয়। উভয় চিত্রকর্ম সম্পন্ন হয়েছিল ১৫৬৫ থেকে ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। পণ্ডিতদের মতে, অতি আকর্ষণীয় এবং আড়ম্বরপূর্ণ 'নারী' চিত্রটিও বিজাপুরের অন্যতম সৃষ্টি। সপ্তদশ শতকের প্রথম পর্ব পর্যন্ত সময়কালে গোলকুণ্ডা এবং আহম্মদনগরও কিছু অমর চিত্রসৃষ্টির কাজ সম্পন্ন করেছিল। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই এদের চিত্রকর্মে শিথিলতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

and vegetation.

The early origins of the Mughal school of painting can be traced back to Kabul which was a culture centre even before its conquest by Babur in 1504. Painting was patronised by Ulugh Beg II, the Timurid ruler of Kabul before Babur. Both Babur and Kamran continued this tradition. Humayun carried forward and strengthened it. During Humayun's exile in Persia, Bihzad, the master painter was at the height of his fame. Humayun patronized many of his disciples, and two of them, Mir Saiyid Ali and Abdus Samad, joined him in Afghanistan, and then moved with him to Delhi.

In about 1567, Akbar ordered the preparation of a lavishly illustrated manuscript of the Persian translation of the *Hamza*

Nama a celebrated Arab epic about a legendary Hamza (no relation of the Prophet). Under Saiyid Ali and Abdus Samad, a group of roughly one hundred painters drawn from Gwaliyar, Gujarat, Lahore, Kashmir, Malwa etc. were collected. It took fifteen years to complete the work, and one thousand and four hundred pages of illustrations were made. This proved to be a training period for many Indian painters. The illustration of many other manuscripts was also taken up during this period. Thus, *Anwar Suhaili*, epics such as *Mahabharata* and *Ramayana*, history books such as *Chingiz Nama*, *Akbar Nama* etc. were illustrated. Unfortunately, many of them have been destroyed, or scattered over many European libraries, specially the Prince of Wales Museum, the John Ryland Library, in Britain. Many of the illustrated manuscripts have now found their way to museums in the USA such as the Boston Museum. This has made the study of the Mughal paintings a difficult and arduous task.

Akbar was very fond of painting and during his reign, painting was organized as an Imperial establishment or *karkhana*. Abul Fazl says: "His Majesty from his earliest youth, has shown a great predilection for this art, and gives it every encouragement." 'From the beginning, both Muslims and Hindus joined in the work. Thus, of the seventeen painters mentioned by name by Abul Fazl, thirteen were Hindus. Some of the Hindus were of the lower castes, such as Daswant who was a palki-bearer till Akbar's eye fell on him and he trained him up. The painters were given monthly salaries, and the Emperor gave them further rewards on the basis of their works which were laid before him regularly. Commodities needed by the painters were provided to them. Attempts were also made to improve the mixture of colours.

Some of the orthodox thinkers of the time objected to the art of painting as being un-Islamic. Abul Fazl answers their objection by arguing that painting made the painter and others recognize God because while sketching anything which had life they realized that God alone could provide individuality to them.

The painters covered a vast field. Their themes included war, hunting scenes, mythical beings, building activities etc. Portrait painting was another favourite theme. Akbar ordered to have the likeliness taken of all the grandees of the realm. He also sat for his portrait. According to Abul Fazl, Basawan was excellent in drawing of features, ,portrait painting and several other branches. However, there was little scope for specialization: two or even

three painters could be used to complete a picture. If one drew the outline, another would fill in the colours, and a third complete the face. The person who drew the outline might be asked to colour the next one, and the one who drew the face draw the outline. Later, Jahangir claimed that he could distinguish which painter had drawn the outline, and who had filled in the colours or drawn the face.

Desapite the composite nature of many of the pictures, differences of style did emerge. Overall, the Akbari period not only established painting firmly, it freed itself from the Persian rigidity of form by introducing the plastic roundness of Indian painting in order to give a three dimensional effect in place of the flat, two dimensional effect. Indian trees and flowers, Indian buildings etc. were also introduced in the pictures. Indian colours, such as peacock blue, the Indian red etc. also began to be used.

Mughal painting reached a climax under Jahangir who had a very discriminating eye. Apart from painting hunting, battle and court scenes, under Jahangir special progress was made in portrait painting and paintings of animals, flowers, etc. Mansur was the great name in this field.

Under Akbar, European painting was introduced at the court by the Portuguese priests. Abul Fazl praises the skill of the European style of painting. Under its influence, the principles of fore-shortening, whereby near and distant people and things could be placed in perspective was adopted. However, Indian painters never fully mastered the art of perspective. Distant objects are often shown in a vertical manner rather than foreshortened as necessary. The earlier bird's eye-view perspective whereby action at different levels could be shown in the same picture was replaced by circular effect.

Despite very lively studies of animals and birds, the Mughal painters had little interest in the study of nature independently. However, trees, birds, streams of water, hillocks often formed the background of many hunting and war scenes. A special feature was the tonal and rounded effect of the tree trunks.

Painting continued to be patronized by Shah Jahan, but he lacked Jahangir's aesthetic sense in this field. Hence, there is a profusion of court scenes and a lavish use of gold.

Aurangzeb's lack of interest in painting led to a dispersal of the artists to different places of the country. This

development of painting in the states of Rajasthana and the Punjab hills.

The Rajasthan style of painting combined the themes and earlier traditions of western India or Jain school of painting with Mughal forms and styles. Thus, in addition to hunting and court scnes, it had paintings on mythological themes, such as the dalliance of Krishna with Radha, or the *Barah-masa*, that is, the seasons, and Ragas (melodies). The *Pahari* school continued these traditions.

মিথলজি / পুরাণ

1) Some Prakash verma → "Mughal Painters and their works."

"Introduction of the self-Portraits Painted in India."

2) Ashok Kumar Das → "Mughal Painting during Jahangir Times."

3) Percy Brown → "Indian Painting under the Mughals."